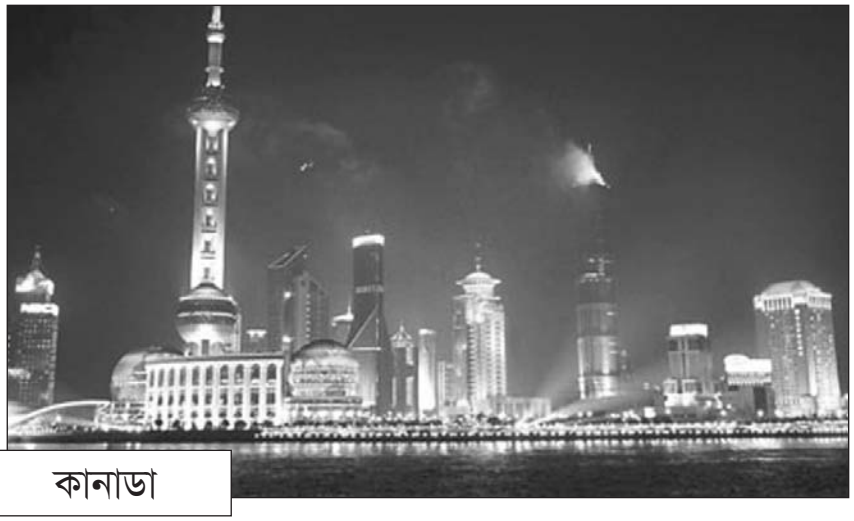

কানাডা

কানাডার নতুন হাইকমিশনারের আগমন

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান

অটোয়া থেকে **জসিম মল্লিক**

কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনারের পদটি নিয়ে এখন আলোচনা চলছে জোরেসোরে। গত অক্টোবরে টরোন্টো ও মন্ট্রিয়ালে বিজেএমই-র সাউথ এশিয়া কানাডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্সের যৌথ উদ্যোগে যে বাংলাদেশ গার্মেন্টস মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে বিজেএমই'র দুই শীর্ষস্থানীয় কর্তা 'ডিজাস্টার' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ব্যর্থতার পরই হাইকমিশনার হিসেবে মহসিন আলী খানকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অবশ্য তিনি তার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেননি। এই প্রতিবেদককে তখন তিনি বলেছিলেন, কানাডা বাংলাদেশকে কোটা ফ্রি ও ডিউটি ফ্রি গার্মেন্টস রপ্তানির যে সুযোগ দিয়েছে, সে ব্যাপারে আমি অনেক কাজ করেছি এবং সফল হয়েছি। তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ঢাকা থেকে তাকে ফিরে আসার জন্য তলব করা হয় এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল রফিক আহমেদ খানকে কানাডায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে হাইকমিশনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর এড়িয়ে যান। তিনি এটাকে কোনো রাজনৈতিক বা ব্যর্থতার শাস্তি বলে মেনে নেননি। তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও রফিক আহমেদ খান যোগ না দেয়ায় মহসিন আলী খানই রয়ে যান। রফিক আহমেদের যোগ না দেয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে, আমেরিকায় তার ইমিগ্রেশন নিয়ে কি সব নাকি ঝামেলা হয়েছে। এদিকে কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের শীর্ষ পদটি নিয়ে জোট সরকারের দুই শরিক মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত বর্তমান হাইকমিশনারের মেয়াদ এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করে পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে ইতিমধ্যেই নিয়োগপ্রাপ্ত রফিক আহমদকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ নিয়ে এখানে বেশ রাজনৈতিক খেলা চলছে।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি অটোয়া ইউনিভার্সিটির এলামনাই অডিটরিয়ামে সাবিনা ইয়াসমিনের একক সঙ্গীত সন্ধ্যায় হাইকমিশনার মহসিন আলী খান উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার চরম শত্রু শামীম ওসমানও উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই একেবারে সামনের কাতারে বসেছিলেন, তবে অনেক দূরত্বে। এটা অবশ্য নিছকই কাকতালীয় ঘটনা। তবু এ নিয়ে অনেকেই মুচকি হেসেছেন। হাইকমিশনার মহোদয় দীর্ঘ চার ঘন্টার কনসার্টটি সস্ত্রীক উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে তার সঙ্গে আমার কথা হয়। 'কবে যাচ্ছেন' জিজ্ঞেস করাতেই তিনি যা উত্তর দিলেন তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। খুব শিগগিরই নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল হিসেবে যোগ দিচ্ছেন বলে জানান তিনি। আর রফিক আহমেদ খানের কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনার হিসেবে যোগদানের ঘোষণা অপরিবর্তিতই রয়েছে। সর্বশেষ খবর হচ্ছে, আগামী ২৬ এপ্রিল রফিক আহমেদ অটোয়াতে তার নতুন দায়িত্বে যোগ দিচ্ছেন। আর মহসিন আলী খান এখন ঢাকায়। তিনি ১ মে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল হিসেবে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।

জার্মানি

রাজনৈতিক আশ্রয় আইনের গোলকধাঁধা

জার্মানি, সরকারি নাম ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি এবং বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। বিশ্বের শিল্পোন্নত আটটি দেশের অন্যতম। ৮ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত জার্মানিতে বিদেশীদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। রাষ্ট্রভাষা জার্মান। ভারী শিল্প যেমন মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ ও সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির কারখানা ছাড়াও উচ্চ প্রযুক্তির ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রনিক্স ভোগ্যপন্ন তৈরিতে বিশ্বের অগ্রগামী দেশগুলোর একটি। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত জার্মানিতে বিদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। অজ্ঞতাই হোক আর কূটনৈতিক ব্যর্থতাই হোক, যেকোনো কারণেই বাড়ছে না শুধু বাঙালির সংখ্যা। আশ্রয় সম্পর্কিত আইন এ দেশে দিন দিন কঠিন হচ্ছে। কঠিন আইনের কারণে এ দেশে গত কয়েক বছরে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। কিন্তু তারপরও থেমে নেই আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। যেমন করেই হোক তৈরি করে নিচ্ছেন নিজের একটি স্থায়ী ঠিকানা। রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণও তেমনি এক পন্থা।

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাম ফেডারেল শরণার্থী দপ্তর। এই দপ্তর আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় আবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং সবশেষে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার একচ্ছত্র ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এই দপ্তর একটি আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে এক মাসের মধ্যে রাজ্যের প্রশাসনিক আদালতে আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ

আশ্রয় আইনের ৫১ এবং ৫৩ নং ধারা

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশী সংক্রান্ত আইনের যে দুটি ধারা অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, তা হলো ঐ আইনের ৫১ এবং ৫৩ নং ধারা। আশ্রয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত প্রায় সমস্ত আশ্রয় মামলার রায়ে যে গৎবাঁধা কথাটি লেখা থাকে, তা হলো 'যেহেতু আবেদনকারী বিদেশী সংক্রান্ত আইনের ধারা ৫১, উপধারা ১ এবং ৫৩ নং ধারার সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তাকে এই মর্মে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জার্মান ভূখন্ড ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। যদি সে এই সময়সীমার মধ্যে জার্মান ভূমি ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাঁকে জোরপূর্বক তার নিজের দেশে অথবা অন্য কোনো দেশে ফেরত পাঠানো হবে, যে দেশ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য।' সাধারণত দেখা যায় যে, আশ্রয় প্রার্থীরা মামলা প্রমাণের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই করে থাকেন, কিন্তু মামলায় না জিতেও যে অন্তত ৫১ এবং ৫৩ নং ধারার শর্তসমূহ পূরণ করে বহিষ্কারাদেশটির বেশ কিছু দিনের জন্য (ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘদিনের জন্য) অকার্যকর করে রেখে এ দেশে অবস্থান প্রলম্বিত করা যায় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেকেই শেষ রক্ষা করতে পারেন না। এখানে ধারা দুটির কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো :

ধারা ৫১ : রাজনৈতিক সমস্যাযুক্ত ব্যক্তির বহিষ্কারাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা। উপধারা ১ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করে এমন কোনো দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না, যে দেশে তার নিজস্ব ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অথবা তার রাজনৈতিক ধ্যানধারণার কারণে তার জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন।

ধারা ৫৩ : বহিষ্কারের পথে অন্তরায়। উপধারা ১ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করে এমন কোনো দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না, যে দেশে তাঁর নির্যাতিত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উপধারা ২ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করে এমন কোনো দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না, যে দেশ তাকে কোনো অপরাধের কারণে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং যেখানে তার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবার ভয় আছে। উপধারা ৩ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করে এমন কোনো দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না, যে দেশ তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুরোধ করেছে। ধরিয়ে দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সে দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না। উপধারা ৪ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করা যাবে না, যদি ১৯৫০ সালের ৪ নভেম্বরের মানবাধিকার কনভেনশন আইন অনুযায়ী বহিষ্কারাদেশটি অবৈধ বলে প্রতীয়মান হয়। উপধারা ৫ : যদি কোনো বিদেশীকে তার দেশে ফেরত পাঠানোর ফলে সে দেশে তার রাজনৈতিক সমস্যা অথবা সে দেশের প্রচলিত আইনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার শাস্তি হবার সম্ভাবনাও থাকে, তবুও তাকে সেই দেশে ফেরতে পাঠানো যেতে পারে। উপধারা ৬ : একজন বিদেশীকে বহিষ্কার করে অন্য এমন কোনো দেশেও ফেরত পাঠানো যাবে না, যে দেশে তার জীবন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রবলভাবে হুমকির সম্মুখীন। যদি ঐ দেশে ঐ বিদেশীর সম্পূর্ণ জাতি এবং গোত্র সামগ্রিকভাবে কোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হয়, তাবে তার জন্য এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আশ্রয় আবেদন নামঞ্জুর হলে তড়িঘড়ি করে উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উকিলকে যে কোনোভাবে এদেশে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করেন, কিন্তু প্রায়ই তারা উকিলকে বোঝাতে সক্ষম হন না যে, কেন তাদের পক্ষে দেশে ফেরত যাওয়া সম্ভব নয়। জার্মান উকিলরাও এমন যে, তারা বিদেশী আশ্রয়প্রার্থী মক্কেলকে যতদূর সম্ভব তার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করার ভনিতা করে। ভাষা সমস্যাও এর একটি প্রধান কারণ। তাই যাদের আশ্রয় আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে

প্রদান করে। আপিল করতে ব্যর্থ হলে এক মাসের মধ্যে জার্মান ভূখন্ড ত্যাগ করার কথাও আদেশনামায় উল্লেখ থাকে। আশ্রয়প্রার্থী উকিলের মাধ্যমে রাজ্যের প্রশাসনিক আদালতে আপিল মামলা দায়ের করে। আশ্রয় মামলার বাদী আশ্রয়প্রার্থী নিজে অথবা তার উকিল এবং বিবাদী ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির পক্ষে ফেডারেল আশ্রয় দপ্তর। এই আপিল মামলা সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আশ্রয়প্রার্থীর ভাগ্য প্রসন্ন হয় না এবং প্রশাসনিক আদালত শরণার্থী দপ্তরের আদেশ বহাল রেখে এক মাসের মধ্যে দেশ ত্যাগ করার পুনরাদেশ প্রদান করে এবং এই রায়কেই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করে। সেক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীর জন্য আইনের অবশিষ্ট সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর ভাগ্য প্রসন্ন হলে প্রশাসনিক আদালত আশ্রয়প্রার্থীকে এই রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক আদালত অথবা রাজ্যের বা কেন্দ্রের সাংবিধানিক আদালতে পুনর্বার আপিল করার সুযোগ দেয়। সেখানেও মামলাটি নিষ্পত্তি হতে তিন থেকে ছয় মাস লেগে যায়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক আদালতে আশ্রয় মামলা খারিজ হয়ে যাবার পর আশ্রয়প্রার্থীর আর তেমন কোনো আশা থাকে না। প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীর হাতে এবার আইনের যে দুর্বল অস্ত্রটি আছে সেটা হচ্ছে আশ্রয় মামলার পুনর্বিবেচনা। এই অস্ত্রটি প্রয়োগ করে আশ্রয়প্রার্থী তার অবস্থান সর্বোচ্চ এক দুই মাস দীর্ঘায়িত করতে পারে। তার পরের সর্বশেষ ধাপটি হচ্ছে রিভিউ প্রার্থনা। এই প্রক্রিয়ায় আদালত মামলাটির কোনো রদবদল না করে পুরো মামলাটি শুধু একবার খতিয়ে দেখে যে আশ্রয়প্রার্থীকে তার প্রাপ্য কোনো আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা হলো কি না। এই প্রক্রিয়াটি নিষ্পত্তি হতেও এক থেকে দুই মাস লেগে যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক উকিল আশ্রয়প্রার্থীকে পরামর্শ দেয় আশ্রয় প্রার্থনা মঞ্জুর করে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে রাজ্যসভার নিম্নকক্ষ বরাবর আবেদন করার জন্য। রাজ্যসভার নিম্নকক্ষ বিষয়টি রাজ্যসভার উচ্চকক্ষে উত্থাপন করে। বিষয়টি অনেক সময় কেন্দ্রীয় সভার নিম্নকক্ষ গড়িয়ে উচ্চকক্ষ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীর ভাগ্য আর প্রসন্ন হয় না। আশ্রয় মামলার প্রতিটি স্তরে উকিলের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অবশেষে একজন হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে পালাবার আয়োজন করা ছাড়া করণীয় তেমন কিছুই থাকে না। অন্যদিকে মামলার অপর পক্ষ ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির পক্ষে থাকে আশ্রয়প্রার্থীকে এক মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করাতে বাধ্য করতে, অন্যথায় বলপূর্বক বহিষ্কার করার আদালতীয় ডিক্রি।

পাঠক ভাবছেন এখানেই হয়তো শেষ। আসলে তা নয়। এবার শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব। আশ্রয়প্রার্থী এবার আশ্রয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করার, অন্যথায় বলপূর্বক বহিষ্কারের হুমকি সংবলিত একটি চিঠি পাবে। পাসপোর্ট এবং টিকিট নিয়ে তাদের দপ্তরে যেতে বলবে। পাসপোর্ট যদি না থাকে তাহলে নিজ দেশের দূতাবাসে গিয়ে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে বলবে। জার্মানির বর্তমানে প্রচলিত আইনে একজন প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীকে তার বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া কোনো অবস্থায় বহিষ্কার করা যায় না। আর তাই একজন আশ্রয়প্রার্থীর বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করা শুধু তখনই সম্ভব হয়, যখন আশ্রয়প্রার্থীর স্বদেশের দূতাবাস আশ্রয়প্রার্থীর জন্য একটি বৈধ পাসপোর্ট ইস্যু করে। যত দিন দূতাবাস পাসপোর্ট ইস্যু না করবে ততদিন তারা উকিলকে সোজাসুজি বলুন যে, উপরোক্ত ধারার বলে আপনাকে স্বদেশে অথবা অন্য কোনো দেশে ফেরতে পাঠানো যাবে না- অবশ্যই যদি আপনার দেশে ফেরত যাবার ইচ্ছে না থাকে এবং ধারাগুলো সত্যিই আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

আশ্রয় আইনের ১৫ ধারা

জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করতে হলে আশ্রয়প্রার্থীকে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। রাজনৈতিক আশ্রয় আইনের (Asylverfahrensgesetz) ১৫ নম্বর ধারাটিতে আশ্রয়প্রার্থীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অনেক আশ্রয়প্রার্থীই আশ্রয় আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে ভীত হয়ে আশ্রয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করেন। অথচ আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে আইনত বাধ্য। ফলশ্রুতিতে আশ্রয় কর্তৃপক্ষ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ১৫ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগে আশ্রয় আইনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০ ধারা প্রয়োগের সুযোগটি ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মামলাটি Offensichtlich unbegruendet বা 'আপাতত দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে নেতিবাচক ফলাফল জানিয়ে দেন। যদিও এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আশ্রয় মামলার ১৫ ধারাটি মেনে চললেই মামলায় জেতা সম্ভব, তথাপি সদাচারের জন্য ইতিবাচক ফলাফল মিলেও যেতে পারে। ১৫ নম্বর ধারাটি নিম্নরূপ-

ধারা ১৫ : আশ্রয় মামলায় সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা (Allgemeine Mitwirkungspflicht) উপধারা ১ : আশ্রয় মামলায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করার জন্য আশ্রয়প্রার্থী বাধ্য। এ ক্ষেত্রে যদি আশ্রয়প্রার্থী কোনো উকিলও নিয়োগ করে থাকেন, তথাপি এই বাধ্যবাধকতা থেকে তিনি নিজে অব্যাহতি পাবেন না। উপদারা ২ : তাছাড়াও আশ্রয়প্রার্থী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য বাধ্য ; (ক) এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিতভাবে বক্তব্য প্রদান করা। (খ) যদি আবেদনকারীকে আগে কখনো ভিসা প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে তা অতিসত্বর শরণার্থী দপ্তরকে অবহিত করা। (গ) কোনো সুনির্দিষ্ট শরণার্থী শিবিরে থাকার জন্য বা কোনো সুনির্দিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলা। (ঘ) এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তার পাসপোর্ট বা বিকল্প পাসপোর্ট হস্তান্তর করা। (ঙ) সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দলিল বা অন্যান্য কাগজপত্র, যা তার নিজস্ব জিম্মায় আছে, তা এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা। (চ) যদি আশ্রয়প্রার্থীর কোনো পাসপোর্ট বা বিকল্প পাসপোর্ট না থাকে, তাহলে তা উত্তোলনের ব্যাপারে সহযোগিতা করা। (ছ) পূর্বনির্ধারিত শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ধৈর্য ধারণ করা। উপধারা ৩ : এই আইনে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বলতে যা বোঝায় : (ক) পাসপোর্ট এবং বিকল্প পাসপোর্ট ছাড়াও যেসব কাগজপত্র থেকে আশ্রয়প্রার্থীর পরিচয় ও নাগরিকত্ব শনাক্ত করা সম্ভব হয়। (খ) অন্য কোনো দেশের ভিসা, অবস্থানের অনুমতিপত্র এবং সীমান্ত অতিক্রমের কাগজপত্র। (গ) উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য যানবাহনে ব্যবহৃত টিকিট। (ঘ) স্বদেশ থেকে জার্মানিতে প্রবেশ পর্যন্ত ভ্রমণপথ, ভ্রমণে ব্যবহৃত যানবাহন এবং অন্য কোনো দেশে অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যপূর্ণ কাগজপত্র। (ঙ) সকল প্রকার কাগজপত্র, যার ওপর আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রয় প্রার্থনার যৌক্তিকতা বা আশ্রয়প্রার্থীকে অন্য কোনো দেশে ফেরত পাঠানোর যৌক্তিকতা নির্ভরশীল। উপধারা ৪ : এই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে আশ্রয়প্রার্থীর শরীর তল্লাশি করতে পারেন যদি আশ্রয়প্রার্থী সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, আশ্রয়প্রার্থীর কাছে কাগজপত্রগুলো আছে। এ ক্ষেত্রে একই লিঙ্গের কোনো ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থীর শরীর তল্লাশি করবেন। উপধারা ৫ : যদি আশ্রয়প্রার্থী তার আশ্রয় আবেদন প্রত্যাহারও করে, তথাপি তিনি তার সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

আশ্রয় কর্তৃপক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর অবস্থানের সাময়িক অনুমতিপত্রটি তিন বা ছয় মাস অন্তর নবায়ন করতেই থাকবে। দূতাবাস ইচ্ছে করলে আশ্রয়প্রার্থীর নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অজুহাতে কালক্ষেপণ করে আশ্রয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কার সংক্রান্ত সব কার্যক্রম স্থবির করে দিতে পারে। অনেক আশ্রয়প্রার্থী এই সুযোগটিকে জার্মানিতে অবস্থান দীর্ঘায়িত করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। চতুর আশ্রয়প্রার্থীদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসকে ম্যানেজ করে পাসপোর্ট ইস্যু প্রক্রিয়াকে ঝুলিয়ে দেন অন্তত কয়েক বছরের জন্য। এই পদ্ধতিতে অনেক আশ্রয়প্রার্থী ক্ষেত্রবিশেষে চার থেকে পাঁচ বছরও ঝুলে থাকতে পারেন। এই পদ্ধতিতে সফল হবার জন্য একজন আশ্রয়প্রার্থীর দলীয় ও আঞ্চলিক পরিচয়, রাজনৈতিক কানেকশন অথবা দূতাবাস কর্মচারীদের সঙ্গে বিশেষ সখ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতিতে বিশ্বের সেরা দেশগুলোর দূতাবাস শুধু জার্মানির মতো উন্নত দেশ বলেই যে দুর্নীতির রাহুমুক্ত হবে এমন ভাবাটাও এখানে বোকামি। অনেক আশ্রয়প্রার্থী পাসপোর্ট ঝুলন- প্রক্রিয়ায় এ দেশে অবস্থানের মেয়াদ দীর্ঘায়িত করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও দূতাবাসের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে জার্মানির কূটনৈতিক সম্পর্কে অনেক সময়ই ফাটল ধরে। এই প্রক্রিয়ারও একদিন অবসান হয়। আশ্রয় কর্তৃপক্ষের চাপে দূতাবাসের পক্ষে একসময় আর কালক্ষেপণ করা সম্ভব হয় না এবং দূতাবাস আশ্রয়প্রার্থীর পাসপোর্ট ইস্যু করে আশ্রয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। পাসপোর্ট হাতে পাবার পর আশ্রয় কর্তৃপক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর অজ্ঞাতে তার অবস্থানের অনুমতিপত্রটি তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয় এবং প্রথমবারের মতো আশ্রয়প্রার্থীর বাসায় হামলা দেয়। ধরা পড়ে গেলে এক কাপড়ে সোজা বিমানবন্দর। টিকেট থাকুক আর নাই থাকুক, সরকারি কোষাগার থেকে টিকেট কেটে স্বদেশের প্লেনে বসিয়ে দেবে। ধরা পড়ে যাওয়া হতভাগ্য আশ্রয়প্রার্থীকে বহিষ্কারের পথে এ পর্যায়ে আর কোনো বাধাই থাকে না।

ইঁদুর-বিড়ালের এই খেলায় আশ্রয়প্রার্থী যদি আশ্রয় কর্তৃপক্ষের চেয়েও এক কাঠি সরস হয় তাহলে সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সোজা চলে যাবে আবার উকিলের কাছে। এত কিছুর পরও আশ্রয় আইনে আশ্রয়প্রার্থীর জন্য কিছু পথ খোলা থাকে। আশ্রয়প্রার্থী এবার উকিলের কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটি গল্প ফেঁদে বসবে। যে গল্পে উল্লেখ থাকবে অতি সম্প্রতি তার স্বদেশে ঘটে যাওয়া কোনো রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার কথা, যে ঘটনার কারণে আশ্রয়প্রার্থীর পক্ষে এই মুহূর্তে দেশে ফিরে যাওয়া তার জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। প্রমাণ স্বরূপ ছবিসহ কিছু পেপারকাটিং এবং দেশের কোনো আত্মীয়স্বজনের চিঠিও সঙ্গে জমা দেবে। বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করার জন্য আপাতত এতটুকুই যথেষ্ট। উকিলের 'টিনের বাক্সে বার টাকা' ফেলে আশ্রয় মামলার ৭১ ধারা অনুযায়ী আবার শুরু হবে আশ্রয় পুনর্মামলার (Asylfolgeantrag) প্রথম ধাপ।

বছরের পর বছর অনেক চড়াই-চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জীবন তারপরও এখানে থেমে থাকে না। চুলে পাক ধরে, মাথায় টাক পড়ে। টাকাও হয়, দেশে সবার মুখে হাসিও ফোটে। কিন্তু স্বদেশের মাটির গন্ধ, অলস দুপুর আর ঝড়ো-বৃষ্টির শব্দ জীবন থেকে হারিয়ে যায় দূর বহুদূরের কোনো অতীতে।

মোঃ ইসমাইল হোসেন (বাবু)
Fridberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

রাজনৈতিক আশ্রয় আইনের ৩০ ধারা

আশ্রয় আইনের ৩০ নং ধারাটিতে কিছু কিছু আশ্রয় আবেদন 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' (Offensichtlich unbegruendet) হিসেবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, জার্মানিতে অনেক বাংলাদেশীর রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন আশ্রয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে নাকচ হয়ে যাচ্ছে এবং অবিলম্বে জার্মান ভূখন্ড ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে আপিল করার আর কোনো প্রকার সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না। আবেদনকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে দেশে ফিরে যাবার জন্য দূতাবাসে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনকারী যদি ইচ্ছে করে, তাহলে নতুন সমস্যা দেখিয়ে ধারা ৭১ অনুযায়ী আশ্রয়ের জন্য পুনঃ আবেদন (Asylfolgeantrag) করতে পারে, যা আশ্রয় মামলার সর্বশেষ ধাপ এবং খুবই অল্প সময়ে নাকচ হতে পারে। সেই সঙ্গে আবেদনকারী তার দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের অনুমতিপত্র 'Aufenthaltsgestattung'টি হারায় এবং তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় একটি স্বল্পমেয়াদি Duldung, যা শুধু পাসপোর্ট হাতে আসা পর্যন্ত তার এ দেশে অবস্থানকে গ্রাহ্য করে। অথচ আশ্রয় আবেদন করার আগে একটু সতর্ক হলে আবেদনটি এভাবে নাকচ হবার সম্ভাবনা থাকে না। ধারাটি এ রকম :

ধারা ৩০ : 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' আশ্রয় আবেদন। উপধারা ১ : রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য একটি আবেদনপত্র 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানের শর্তসমূহ এবং আশ্রয় আইনের ৫১ নং ধারার প্রথম উপধারাটির শর্তসমূহ পূরণ না হয়। (ধারাটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)

উপধারা ২ : তাছাড়াও রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য একটি আবেদনপত্র 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী শুধু অর্থনৈতিক কারণে অথবা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কোনো সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেতে অথবা ব্যক্তিগত সংঘাতপূর্ণ কোনো পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে জার্মান ভূ-খন্ডে থাকতে আগ্রহী।

উপধারা ৩ : রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য একটি আবেদনপত্র 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে প্রত্যাখ্যান হতে পারে নিম্নোক্ত কারণে : ক. যদি উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোতে আবেদনকারীর বক্তব্য অন্তঃসারশূন্য অথবা পরস্পর বিরোধী হয়, অথবা আবেদনকারীর বক্তব্য মূল ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, অথবা যদি আবেদনকারী মিথ্যা ও জাল কাগজপত্র জমা দেয়। খ. আশ্রয় মামলায় তার পরিচয় ও জাতীয়তা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে অথবা সত্যিকার তথ্য দিতে অস্বীকার করে। গ. ইতিপূর্বে অন্য নামে অন্য একটি আশ্রয় মামলা দায়ের করে থাকে। ঘ. জার্মানিতে থাকার জন্য অন্য কোনো উপায় না পেয়ে তাৎক্ষণিক আশ্রয় মামলা দায়ের করে, যদিও আবেদনকারীর হাতে আগে মামলা করার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল। ঙ. আশ্রয় কর্তৃপক্ষকে শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা না করে বা করতে ব্যর্থ হয়। চ. ইতিপূর্বে অভিবাসন আইনের ধারা ৪৭ অনুযায়ী বিপজ্জনক কর্মকান্ডের কারণে জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকে।

উপধারা ৪ : তাছাড়াও একটি আশ্রয় আবেদন 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে প্রত্যাখ্যান হতে পারে যদি অভিবাসন আইনের ধারা ৫১, উপধারা ৩ : আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ যদি কোনো অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে আবেদনকারীর কমপক্ষে তিন বছরের কারাদন্ড হয় এবং যদি সে জার্মানির নিরাপত্তা এবং জার্মান ও জার্মানিতে বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো বিপদ বা হুমকির কারণ হয়।

উপধারা ৫ : তাছাড়াও আশ্রয় কর্তৃপক্ষ একটি আশ্রয় আবেদন 'আপাতদৃষ্টিতে ভিত্তিহীন' হিসেবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে যদি আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান না হয় যে, আবেদনকারী রাজনৈতিক সমস্যার কারণে নিরাপত্তার জন্য জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছে।